মুঘল শিল্পকলা বা চিত্রশিল্প

ভারতীয় শিল্পকলায় মুঘল শাসকরা এক গুরুত্বপূর্ণ নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। মুঘল শাসকরাই প্রথম ভারতবর্ষে তরবারি, কলম ও ছবি অঙ্কনের তুলিকে সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাঁদের সৃষ্ট কালজয়ী অভূতপূর্ব স্থাপত্য শিল্পের পাশাপাশি চিত্রশিল্পও এক অভাবনীয় মর্যাদার স্থান অধিকার করেছিল। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মুঘল যুগে যেমন অসাধারণ অগ্রগতি দেখা যায়, চিত্রশিল্পের মধ্যেও মুঘল যুগের শিল্পভাবনা ও মননশীলতার উৎকর্ষ লক্ষ করা যায়। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের জয়লাভের বহু পূর্বেই ভারতবর্ষে জৌনপুর, মান্ডু, আহমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানের মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় 'মিনিয়েচার' চিত্রের বিকাশ ঘটেছিল। তাছাড়া জৈন চিত্রকরদের আঁকা মিনিয়েচার চিত্রের বহু নিদর্শন জৈন-মন্দির সংলগ্ন পাঠাগারে পাওয়া যায়। ভারতীয় এই মিনিয়েচার চিত্রশৈলী মুঘলদের সংস্পর্শে পারসিক চিত্ররসে সিক্ত হয়ে এক নবজীবন লাভ করে। মুঘলদের চিন্তাভাবনায় মুঘল মিনিয়েচার চিত্রশিল্প এমন অভূতপূর্ব রূপ লাভ করে, যা ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। মহান মুঘলরা ভারতবর্ষ থেকে বিলুপ্ত হলেও, তাঁদের সৃষ্ট চিত্রশিল্পের প্রভাব দাক্ষিণাত্য, রাজস্থান, পাঞ্জাব ও উত্তর-ভারতের চিত্রশিল্পে দীর্ঘদিন স্থায়িত্ব লাভ করে। মুঘলরা পারসিক ও ভারতীয় চিত্ররসের সমন্বয়ে স্থাপত্যের মতোই এক স্বতন্ত্র চিত্রশিল্পের বিকাশসাধন করেন।

সুলতানি যুগে চিত্রশিল্পের তেমন কদর ছিল না বললেই চলে। তবে আমির খসরু, সামসি-সিরাজ-আফিফ ও মৌলানা দাউদ প্রভৃত সমসাময়িক লেখকদের লেখা গ্রন্থে দেওয়াল-চিত্র ও চিত্রকরদের পরিচয় পাওয়া যায়। মুঘলরাই প্রথম চিত্রশিল্পের মতো ভারতীয় এক সংস্কৃতির চরম বিকাশে আত্মনিয়োগ করেন। মুঘলদের চিত্রকলার মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়—(১) মুঘল স্থাপত্য শিল্প যেমন পারসিক স্থাপত্য শিল্পের রস সংগ্রহ করে এক কালজয়ী স্থাপত্য শিল্পে পরিণত হয়েছে, চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও ভারতীয় চিত্ররসের সঙ্গে পারসিক চিত্ররসের সমন্বয়ে এক স্বতন্ত্র চিত্রশিল্পের বিকাশ সাধিত হয়। (২) ভারতীয় চিত্রশিল্পীরা পারসিক চিত্রশিল্পকে নিজেদের মতো করে প্রয়োগ করেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ও পারসিক চিত্রকলার মধ্যে তেমন মৌলিক প্রভেদ ছিল না, কিন্তু ভারতীয় চিত্রশিল্পের উদ্দেশ্য, অনুভূতি ও মেজাজ ছিল স্বতন্ত্র। (৩) মুঘল চিত্রশিল্পের বিষয়বস্তু ছিল কঠোর বাস্তব। সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা, শিকার, প্রাকৃতিক দৃশ্য, গাছ, পশু, পাখি প্রভৃতি মুঘল চিত্রশিল্পের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। কিন্তু ভারতীয় চিত্রকলার মূল বিষয়বস্তু ছিল প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত কল্পনা। (৪) মুঘল চিত্রকলায় ভারতীয় রীতির সঙ্গে বৌদ্ধ, বহ্লিক, ইরানীয় ও চীনা শিল্প-রীতির এক অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। (৫) মুঘলদের পূর্বে ভারতীয় চিত্রশিল্পে

বৃহৎ পরিসরে চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় চিত্রশিল্পে ক্ষুদ্র পরিসরে চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি অথবা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের ব্যাখ্যার চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি মুঘলদের শিল্প-রীতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। (৬) বাবর ও হুমায়ুন পারসিক শিল্প-রীতির অনুরাগী হলেও, আকবরের সময় এই শিল্প-রীতি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় চরিত্র লাভ করে। (৭) জাহাঙ্গিরের আমলে মুঘল চিত্রশিল্পে আঙ্গিক অপেক্ষা বক্তব্য প্রাধান্য পায় এবং বিষয়টির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য সৃষ্টির উপর জোর দেওয়া হয়। (৮) মুঘল চিত্রশিল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলি, যুদ্ধযাত্রা এবং দরবারে সম্রাটকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দৃশ্যের চিত্র আঁকা হয়। এমনকি প্রাকৃতিক দৃশ্য, পাখি, গাছপালা, জীবজন্তু এবং রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনাবলিকেও স্থান দেওয়া হয়েছে। চিত্রগুলি ছিল বৃহদায়তন এবং তাতে তুলির কাজ ছিল অসাধারণ। (৯) মুঘল যুগের চিত্রশিল্পে কোনো কোনো আধুনিক শিল্প-বিশেষজ্ঞ, বিশেষ করে পার্সি ব্রাউন আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, তা হল—ইওরোপীয় চিত্রশিল্পের প্রভাব। সম্ভবত মুঘল দরবারে স্যার টমাস রো, হকিন্স প্রমুখ ইওরোপীয় রাষ্ট্রদূতদের আগমনের ফলেই মুঘল চিত্রশিল্পে ইওরোপীয় প্রভাব পড়ে। তবে মুঘল চিত্রশিল্পের সবিশেষ বৈশিষ্ট্য—পারসিক চিত্রশিল্পের সঙ্গে ভারতীয় চিত্রশিল্পের সংমিশ্রণে অনবদ্য চিত্রের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিখ্যাত মুঘল চিত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে; তা হল—শিল্পী বিষেণ দাসের আঁকা দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ এবং একই শিল্পীর আঁকা রাবণের সীতাহরণ ও জটায়ু বধ। আকবরের বাল্যকালের ছবি 'হামজানামা' নামে পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়। 'হামজানামা'তে ১২০০ চিত্র ছিল, কিন্তু সংক্ষিপ্ত কয়েকটি উদ্ধার করা গেছে।

বাবর ও হুমায়ুন দু'জনেই রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতির জন্য চিত্রকলা-শিল্পে তেমন অবদান না রেখে যেতে পারলেও, বাবর যে সৌন্দর্য ও প্রকৃতির প্রেমিক ছিলেন, তা তাঁর আত্মজীবনীতে স্বাক্ষর পাওয়া যায়। এমনকি দরবারে তিনি চিত্রশিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তারও সাক্ষ্য পাওয়া যায়। হুমায়ুন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সিংহাসনচ্যুত হয়ে যাযাবর জীবন বেছে নিতে বাধ্য হওয়ায়, তাঁর মতো সৌন্দর্য ও শিল্পের পূজারীও মুঘল শিল্প-রীতিতে স্থায়ী ছাপ রেখে যেতে সমর্থ হননি। কিন্তু তাঁর এই যাযাবর জীবনের অবসান ঘটানোর জন্য তাঁর বিপদের বন্ধু বৈরাম খান তাঁকে পারস্যের রাজদরবারে সাহায্যের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। পারস্যের রাজদরবারে কিছুকাল সস্ত্রীক অবস্থান করেই হুমায়ুন ভারতবর্ষে মুঘল স্থাপত্য শিল্পে ও চিত্রশিল্পে পারসিক প্রভাবের ভিত নির্মাণ করে যান। পারস্য-ভারতের এই সম্পর্কই ভারতবর্ষে মুঘল স্থাপত্য শিল্পে ও চিত্রশিল্পে এক নতুন যুগের সূচনা করে। হুমায়ুন প্রথম পারস্যের দুই শিল্পী মির সৈয়দ আলি ও আবদুস সামাদকে কাবুলে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। পরবর্তীকালে মহামতি আকবর সামাদের নেতৃত্বেই একটি কলাভবন নির্মাণ করেন।

প্রকৃতপক্ষে আকবরের রাজত্বকালেই মুঘল চিত্রকলার যাত্রা শুরু হয়েছিল। জাহাঙ্গিরের আমলে তা বিকশিত হতে থাকে এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে বিকাশের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। মুঘলরীতির বিকাশ মূলত পাণ্ডুলিপি অঙ্কনের মধ্য দিয়েই হয়েছে। আকবরের

রাজত্বকালের শেষদিকে পারসিক ও পাশ্চাত্য অঙ্কন-রীতির প্রভাবে মুঘল চিত্রকরদের মধ্যে প্রতিকৃতি অঙ্কনের ঝোঁক দেখা দেয়। সাধারণভাবে আকবরের শাসনকালে রেওয়াজ ছিল নিজস্ব চিত্রকরদের দিয়ে তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতিকৃতি আঁকিয়েছিলেন এবং আগেই জানিয়েছি, একটি কলাভবনও নির্মিত হয়েছিল। সশরীরে চিত্রকরের সামনে বসে বা দাঁড়িয়ে নিজের ছবির উপযুক্ত দেহভঙ্গি তিনি নিজেই দিতেন। তাঁর দরবারের চিত্রকরদের মধ্যে বসাওয়ান ছিলেন প্রতিকৃতি অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত। আবুল ফজল *আইন-ই-আকবরী*-তে এই অগ্রগণ্য শিল্পীর দক্ষতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, যে পটভূমির চিত্রণ ও মুখাবয়বের রেখাঙ্কন, রঙের বিস্তার এবং প্রতিকৃতি অঙ্কনে তিনি সর্বাধিক দক্ষ ছিলেন। আবুল ফজল প্রথম শ্রেণির যে ১৭ জন শিল্পীর নাম উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে ১৩ জন হিন্দু ছিলেন। এর ফলে মুঘল চিত্রশিল্পে ভারতীয় প্রভাব সহজেই এসে পড়ে। আকবরের দরবারে গুণী মুসলমান শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন আবদুস সামাদ ও সৈয়দ আলি ফারুক বেগ। আকবরের অন্য চিত্রকরদের মধ্যে দমওয়ন্ত, মধু, লাল, কানহা, মিস্কিন, সাম্বলা, তারা, নানহা, ভগবান ও কেসুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুঘল চিত্রকলার বিকাশে এঁদের অবদান ছিল অপরিহার্য। ষোড়শ শতাব্দীতে চিত্রিত মুঘল্ পাণ্ডুলিপিগুলির অধিকাংশ প্রতিকৃতিই এঁরা করেছেন। আকবরের নির্দেশে যে বিখ্যাত চিত্রগুলি আঁকা হয়, তার মধ্যে ফতেপুর সিক্রিতে আঁকা চিত্রগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশাল অঙ্কন পর্বের সম্ভার 'হামজানামা'তে বারোশো ছবি পাওয়া যায়। অবশ্য এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বদায়ুনির মতে, 'হামজানামা' আকবরের উদ্যোগে এই অপর চিত্রগুচ্ছের অঙ্কন সম্পন্ন হয়েছিল। আবার আলাউদ্দিন কাজভিনি উল্লেখ করেছেন, হুমায়ুন মির নিসার আলির নেতৃত্বে একগুচ্ছ চিত্রকরদের দিয়ে সম্পন্ন করেছিলেন। সম্ভবত আকবরের উদ্যোগেই 'হামজানামা' সম্পন্ন হয়েছিল। 'হামজানামা'র চিত্রগুলিতে পারসিক প্রভাব স্পষ্ট। আকবরি যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রগুলি সংরক্ষিত আছে ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট জাদুঘরের সংগ্রহশালায়। এগুলি মিনিয়েচার চিত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এখানেই আকবরের উৎসাহে চিত্রিত রামায়ণের চিত্রাবলি সংরক্ষিত আছে। আকবরের সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থেরও চিত্র-অলংকরণ করা হয়। আকবরের ধর্ম-সমন্বয়ের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর পাঠাগারে রক্ষিত বিভিন্ন ধর্মপুস্তকের চিত্র-অলংকরণে। আবার 'আকবরনামা' গ্রন্থের চিত্রায়ণে যে সুন্দরতম কিছু চিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়, তা বিশেষ এক বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। এখানে চিত্রকর হাজির হয়েছেন একেবারে কঠোর বাস্তববোধ ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে।

জাহাঙ্গিরের আমলেই মুঘল চিত্রশিল্পের স্বর্ণযুগ শুরু হয়। জাহাঙ্গির ছিলেন সৌন্দর্যের অনুরাগী ও প্রকৃতি প্রেমিক। তিনি প্রকৃতিকে এত গভীরভাবে ভালোবাসতেন যে, তিনিই একমাত্র মুঘল সম্রাট, যিনি প্রকৃতির টানে উনিশ বার কাশ্মীর গিয়েছিলেন। এ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, এরকম প্রকৃতি পাগলের হাতে চিত্রশিল্প কী অভাবনীয় রূপ লাভ করতে পারে। তিনি নিজেই ছিলেন একজন দক্ষ চিত্রকর। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে দাবি করেছেন যে, কয়েকজন চিত্রকর যদি একসঙ্গে কোনো একটি চিত্র অঙ্কন করেন, তাহলে

কোন্ চিত্রকর চিত্রের কোন্ অংশটি এঁকেছেন, তা তিনি বলে দিতে পারতেন। এ থেকে তিনি চিত্রকলার কী সমঝদার ছিলেন, তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তিনি নিজে একজন বিখ্যাত চিত্র-সংগ্রাহক ছিলেন। স্যার টমাস রো জাহাঙ্গিরকে একজন চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ অনুরাগী বলে অভিহিত করেছেন।

চিত্রকরদের কাজ ও ক্ষমতার দিকে জাহাঙ্গিরের সদাজাগ্রত দৃষ্টি ছিল। আত্মজীবনী 'তুজুক'-এ তিনি আবদুস সামাদ, আকা হাসান, আবুল রিজা, ফারুক বেগ, মনসুর ও বিষেণ দাস প্রমুখ চিত্রকরদের নাম উল্লেখ করেছেন। বিচিত্র, গোবর্ধন, হাশিম, দৌলত ও পিদারথ-এর মতো চিত্রকরদের নাম তদানীন্তন সাহিত্যে পাওয়া যায় না ; যদিও এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তবে বিষেণ দাস প্রতিকৃতি অঙ্কনে অদ্বিতীয় ছিলেন। জাহাঙ্গিরের প্রিয় অমাত্য এনায়েত খানের মৃত্যুর পূর্বে অঙ্কিত অসাধারণ এক প্রতিকৃতি বিষেণ দাসের অনবদ্য সৃষ্টি। জাহাঙ্গিরের সময় চিত্রশিল্প সম্পূর্ণ ভারতীয় রূপ লাভ করে। জাহাঙ্গিরের সময় মুঘল অঙ্কন-রীতিতে বিভিন্ন বিষয়ের অভিব্যক্তি ও তার স্বচ্ছন্দ স্বরূপ মেলে ধরে। পাণ্ডুলিপির প্রসঙ্গ-চিত্র থেকে শুরু করে প্রতিকৃতি অঙ্কন। চিত্রকরদের বিষয় ও আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় রাজপুরুষ, বিশিষ্ট ব্যক্তি, সন্ত, গায়ক শিল্পী এবং অন্যান্য শ্রেণির মানুষের ছবিগুলি। এর অনেকগুলিতে পশুপাখি-ফুলফল বিষয়ক অধ্যায়ের ছাপ দেখা যায়। বিভিন্ন ভাব ফুটিয়ে তোলার জ্বলন্ত উদাহরণ হল—মুঘল রীতির রূপকাত্মক চিত্রগুলি। রূপকধর্মী চিত্রকলার দ্রুতবিকাশ সম্ভব হয়েছিল জাহাঙ্গিরের চিত্রকর বিচিত্র ও আবুল হাসানের মৌলিক প্রয়াসের ফলে। এদিক থেকে দেখলে, বিচিত্রের কাজের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল—ওয়াশিংটনের ফ্রিয়ার আর্ট গ্যালারিতে সংরক্ষিত 'জাহাঙ্গির বিদ্বানকে সম্মান দিচ্ছেন'। বিচিত্রের আর একটি একই ধরনের কাজ হল—'শাহজাহান ভূমণ্ডলে দণ্ডায়মান'। এই ছবিতে দেখানো হয়েছে—ভূমণ্ডল শাহজাহানের পদানত এবং এই রূপকটির মধ্য দিয়ে সম্রাটের অসীম প্রতিপত্তি দেখানো হয়েছে। এরকম রূপকধর্মী চিত্রগুলি মুঘল অঙ্কন-রীতিতে মৌলিক। তবে রূপকধর্মী চিত্রকলার বিকাশে আবুল হাসান ছিলেন সবচেয়ে অভিজাত শিল্পী। রঙের সুষম ব্যবহারে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। মনসুর ছিলেন বিরল প্রজাতির পশু, পাখি ও ফুলের চিত্র অঙ্কনে অদ্বিতীয়। চিত্রগুলি যেন জীবন্ত। কলকাতা জাদুঘরে সংরক্ষিত সাইবেরীয় সারসটি আজও তাঁর অঙ্কন-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে বিবেচিত।

জাহাঙ্গিরের সময়েই মুঘল চিত্রকলায় ইওরোপীয় চিত্রশিল্পের প্রভাব পড়ে। এমনকি খ্রিস্টান ধর্মের বিষয়বস্তুও মুঘল চিত্রশিল্পে স্থানলাভ করে। জাহাঙ্গিরের পৃষ্ঠপোষকতাতেই মুঘল চিত্রশিল্পের বিভিন্ন দিক বিকশিত হয়। চিত্রের সঙ্গে চিত্রকরের নামোল্লেখ প্রথাটি ভারতীয় কলায় মুঘলদেরই অবদান। সম্ভবত চিত্রকরদের অঙ্কিত চিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব যাচাই করে পুরস্কার দেওয়ার পদ্ধতির রীতি থেকেই এই প্রথার প্রবর্তন হয়েছিল। জাহাঙ্গিরের হাতেই মুঘল চিত্রশিল্প নানা রঙের বৈচিত্র্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন নবরূপ লাভ করে, অপরদিকে তেমনি পারসিক প্রভাব মুক্ত হয়ে ভারতীয় শিল্পকলায় রূপান্তরিত হয়। মুঘল

চিত্রশিল্পে জাহাঙ্গিরের অসামান্য অবদানের কথা বলতে গিয়ে পার্সি ব্রাউন মন্তব্য করেছেন—"জাহাঙ্গিরের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে মুঘল চিত্রশিল্পের আত্মা অবলুপ্ত হয়।"

জাহাঙ্গিরের পুত্র শাহজাহানও সৌন্দর্যের পূজারি ছিলেন। কিন্তু তিনি পিতার সৃষ্ট চিত্রশিল্পের প্রতি অনুরাগী না হয়ে জাঁকজমকপূর্ণ স্থাপত্য শিল্পের দিকে অনুরাগী হওয়ায়, চিত্রশিল্প অবহেলিত হয়। তাঁর রাজত্বকালে অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে শিল্প অপেক্ষা রঙের আতিশয্য ও আড়ম্বর অধিক পরিমাণে দেখা যায়। শাহজাহানের সময় বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন মির হাসান, অনুপ, চিত্রা ও চিত্রামণি। শাহজাহানের ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতা থেকে মুঘল চিত্রশিল্প বঞ্চিত হওয়ায়, মুঘল চিত্রশিল্পের দৈন্যতা সূচিত হয়। তবে শাজাহানের রাজত্বকালেও রাজদরবারে, বিশেষ করে শাহজাহানের বিখ্যাত আসফ খানের চিত্রশিল্প পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত হয়। শাহজাহান ব্যক্তিগতভাবে নিজের বীরত্বমূলক চিত্রাঙ্কনের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখান। শাহজাহানের রাজত্বকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্রায়ণ হল—'শাহজাহাননামা'র চিত্রায়ণ। তবে লাহোরে অবস্থিত আসফ খানের বাসভবন দেশের সবচেয়ে সুন্দরতম সৌধ ছিল এবং এই সৌধের চিত্রাবলি বিভিন্ন চিত্রকরদের দিয়ে অঙ্কন করিয়েছিলেন। শাহজাহানের পুত্র দারাশুকো চিত্রশিল্পের পূজারি ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রস্থানে চিত্রশিল্পের অপূরণীয় ক্ষতি হয়।

শাহজাহানের রাজত্বকালে চিত্রশিল্পের যে অবক্ষয়ের সূচনা হয়, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। ঔরঙ্গজেব কঠোর বাস্তববাদী ও সর্বপ্রকার বিলাস বর্জনে বিশ্বাসী হওয়ায়, চিত্রশিল্পের পশ্চাতে অর্থব্যয়কে অর্থের অপচয় এবং ইসলাম-বিরোধী বলে মনে করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুঘল রাজদরবার থেকে চিত্রশিল্প একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধশিবির ও যুদ্ধে অংশগ্রহণের দৃশ্যগুলির চিত্র থেকে একথা উপলব্ধি করা যায়। ঔরঙ্গজেব স্বয়ং সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধিভবনের সাদা রং করিয়েছিলেন। মুঘল চিত্রশিল্প রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা হারালে, এই শিল্পকলা লক্ষ্ণৌ, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, মহীশূর ও হায়দ্রাবাদে চলে যায়। কিন্তু একমাত্র লক্ষ্ণৌ ছাড়া এই শিল্পকলা কোথাও তেমন উন্নতমানের পরিচয় দিতে পারেনি।

প্রকৃতপক্ষে মুঘল চিত্রশিল্পের রীতি ও বিষয়বস্তু ছিল—"materialistic, exotic and eclectic"। কিন্তু ভারতীয় চিত্রশিল্পের বিষয়বস্তু ছিল—"spiritual and symbolic"। উপরন্তু মুঘল চিত্রশিল্পে জনসাধারণের যোগ ছিল না বললেই চলে। শুধুমাত্র শাসকশ্রেণি ও রাজকুমাররা ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক। রাজদরবারের বাইরে এর অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে।

মুঘল যুগের দরবারের বাইরে এক ধরনের শিল্পের বিকাশ রাজপুতনায় হয়। পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে চিত্র অঙ্কনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজপুত শিল্প-শৈলী বলতে জনসাধারণের জীবন ও দৃশ্যই ছিল মূল বিষয়বস্তু। রাজপুত চিত্রকররা মিনিয়েচার চিত্রশিল্পে অবদান রেখে গেছেন। তাঁদের সৃষ্ট নারীচিত্র অত্যন্ত সুন্দর ও আনন্দদায়ক। রাজপুত চিত্রশৈলীর পাশাপাশি দাক্ষিণাত্যে দক্ষিণী রীতিতে উদ্ভূত এক চিত্রশিল্প গড়ে ওঠে। তবে উন্নতমানের ছিল কিনা, এ নিয়ে বিতর্ক আছে। দক্ষিণী রীতিতে অঙ্কিত চিত্রগুলি সম্ভবত 'পেশোয়াগণ' মুঘল রাজদরবার থেকে নিয়ে চলে গিয়েছিল। অবশ্য দক্ষিণী রীতির চিত্রশিল্প মুঘল যুগের চিত্রশিল্পের অনুরূপ।

কিন্তু রাজপুত চিত্রশিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল—"delicacy of time, brilliancy of colour and minuteness of decorative detail"। অন্যদিকে কাংড়া অঞ্চলের 'পাহাড়ি শিল্প-রীতি' নামে এক ধরনের শিল্প-রীতি খুবই উন্নতমানের ছিল। আর রাজপুত ও মুঘল চিত্রশিল্প আধুনিক ইওরোপীয় ও ভারতীয় শিল্পীদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করারও চেষ্টা চলেছে। তবে রাজপুতনার চিত্রশিল্পে মুঘল ধারার ছাপ স্পষ্ট।